www.darulilm.org

বালির প্রাসাদ! | দারুল ইলম

19 - 24 minutes

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। তবে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এ অবস্থার ক্রমাবনতি ও দীর্ঘায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কারণ হল সমস্যার মূল কারণসমূহ ও উত্তরণের সঠিক পথকে চিনতে না পারা।

ভুল পথে ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ পথিককে গন্তব্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। একারণে যেসব ভুল পদ্ধতিকে সাময়িক সমাধান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো সমস্যাকে আরো তীব্র করে। ভুল মানহাজের প্রবর্তক ও প্রচারকেরা এ কারণে শুধু নিজেরা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন না বরং উম্মাহকেও নিজেদের বিভ্রান্তির মধ্যে টেনে নামান। গত ১০০ বছরের অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন এ দোষে দুষ্ট।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও উম্মাহর উত্তরণের পদ্ধতি হিসাসবে প্রচারিত এমন একটি ভুল মানহাজ হল – তাগুতের বিরুদ্ধাচারন না করে, তার বিরুদ্ধে কোন রকমের পদক্ষেপ না নিয়ে, তার সতর্ক চোখের সামনে ও কঠিন মুঠির ভেতরে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও শক্তি অর্জন করা – এবং এক সময় ক্ষমতা দখল করে নেয়া। মূলত ফিরাউন জামাল আব্দুন নাসের ও আনওয়ার সাদাতেরর সময়কার কঠোর পরীক্ষার সময় ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ভেতর যে ইরজায়ী ও পরাজিত চিন্তা শক্তভাবে শেকড় গাড়ে – এ হল তার ফসল। ইউসুফ কারদাবিসহ বিভিন্ন ইখওয়ানপন্থি বুদ্ধিজীবি নানা ধরনেরর কথার পসরা সাজিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এ সমাধান ফেরি করে যাচ্ছে।

আর বিপদ এড়িয়ে চলা ও ব্যাপক পরিবর্তনের মুখোমুখি হবার সহজাত প্রবনতার কারণে মানুষ সহজে এধরনের প্রেসক্রিপশন গ্রহণে রাজি হয়েছে। কারণ এ সমাধান দাওয়াহ, ইদাদ, রিবাত, হিজরত আর ক্বিতালের মতো কঠিন কাজের কথা বলে না। নিজের জীবনযাত্রা বর্তমান ধারাকে পুরোপুরী বজায় রেখে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথা বলে।

বাস্তবতা হল এ মানহাজ হল সমুদ্র তীরে বালুর প্রাসাদ তৈরির মানহাজ। ভাটার সময় আপনি ১০০ মিটার উচু বালুর প্রাসাদ বানাতে পারবেন। নানা রকম শামুক, ঝিনুক, পাথর আর অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দিয়ে সাজিয়ে একে অবাক করা সৌন্দর্য দান করতে পারবেন, দর্শনার্থীদের কাছ থেকে বাহবা পাবেন, বিপদ থেকে তুলনামূলকভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু জোয়ার আসার পর ১০০ কিংবা ১০০০ মিটার – বালুর প্রাসাদ ধ্বসে পড়বেই। মিনিটের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হবে।

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামি দীর্ঘদিন ধরে সফলতার সাথে মানহাজের ওপর কাজ করেছে। বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছিল। এর মাধ্যমে শক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বানাতে সক্ষম হয়েছিল। অত্যন্ত সুচারুভাবেই তারা একাজ করেছিল। কিন্তু জোয়ার এসে তাদের কয়েক দশকের প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তাদের মুকুট ইসলামি ব্যাঙ্কই বেহাত হয়েছে। এখন ইসলামি

ব্যাঙ্ক পরিণত হয়েছে আওয়ামি ও ঋণখেলাপিদের সেবাদান কেন্দ্রে। অথচ এ প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য বারবার তারা দ্বীনের সাথে, শরীয়াহর সাথে আপোষ করেছে (যদিও ইসলামি ব্যাঙ্কের মূল ধারনাই শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। তাই আপোষের ওপরেই তাদের শুরু।)। দেশে-বিদেশে এরকম উদাহরণ অনেক।

দুঃখজনকভাবে তারা এ থেকে শিক্ষা নেয়নি। আর বর্তমানে বাংলাদেশের কওমিদের মধ্যে এ মানহাজের প্রচারক ও সমর্থক বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাপলা চত্বরের ঘটনার পর যখন তাদের উচিৎ ছিল গভীরভাবে বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষন পর্যালোচনা এবং আত্ম নিরীক্ষণ ও আত্মসমালোচনায় মনযোগী হওয়া – তখন তারা আগের ভুলগুলোরই পুনরাবৃত্তি করাকে বেছে নিয়েছে। কেউ মগ্ন হয়ে আছে অন্ধ ব্যক্তিপূজায়, শরীয়তের চেয়ে মাসলাককে বেশি গুরুত্ব দেয়ায় – কেউ মগ্ন হয়ে আছে "লা-মাযহাবিদের বিরুদ্ধে জিহাদে" – কেউ মগ্ন লক্ষ মুফতির ফতোয়া কিংবা সনদ নিয়ে – তরুণদের এক অংশ মগ্ন হয়েছে মুভের মতো ফাউন্ডেশনগুলোর মোহে – কেউ সাহিত্য আর কাব্য করতে ব্যস্ত – কেউ মডারেট ইসলামে দীক্ষা নিচ্ছে – আর কেউ ইখওয়ান ও জামাতের ভুলকে পুনরুজ্জীবিত করছে – বালুর প্রাসাদ গড়া মানহাজকে আকড়ে ধরতে চাইছে।

অথচ তুলনামূলকভাবে আন্দোলন হিসাবে অনেক বেশি নিয়মতান্ত্রিক, সুসংহত ও সুশৃঙ্খল জামায়াত ইসলাম ও শিবিরের উদাহরণ তাদের সামনেই আছে। কিন্তু তারা বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিতে আগ্রহী না। যদিও মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দু বার দংশিত হয় না।

বর্তমানে তাই জামায়াতে ইসলামি এবং কওমিদের একাংশ আবারো এই ভ্রান্ত ও ব্যর্থ মানহাজের পক্ষে কাজ ও প্রচারণার দায়িত্ব পালন করছে। শুধু তাই না এ বিভ্রান্তিকে তাদের অনেক দলিল ও বাস্তবতা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও নিখুত তাওহিদ ও জিহাদের মানহাজের বিপরীতে দাড় করাতে চাইছে। যদিও এ ভ্রান্ত মানহাজের ভুলগুলো অনেকেই অনুভব করতে পারেন, তথাপি এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন লেখা চোখে না পরাই নিচের আলোচনাটি পেশ করতে চাইছি। যখন বালুর প্রাসাদের প্রচারক ও সমর্থকরা নিজের মানহাজের আপাত সাফল্যের ফিরিস্তি কিংবা গুনগান গাইবে, তাদের টুনকো সাময়িক কিছু অর্জন দেখিয়ে জিহাদের মানহাজের সমালচনার লিপ্ত হবে, শিশুদের খেলাধুলাকে সতিকার পুরুষদের কাজের বিপরীতে একই পাল্লায় রাখতে চাইবে – তখন আশা করি এই আলোচনা তাদের মানসিক বৈকল্য ও বিভ্রান্তি দূরীকরনে অথবা তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে উপকারী হবে।

আলোচনাটি শাইখ আবু বাকর নাজীর রাহিমাহুল্লাহ "ইদরাতুল তাওয়াহ্*হুশ" থেকে সংকলন করা হয়েছে। সহজবোধ্যতা ও আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য আমি কিছুটা পরিমার্জন করেছি। আশা করি আগ্রহী পাঠক লেখা থেকে উপকৃত হবে বিইজনিল্লাহ। সোশাল মিডিয়াতে সক্রিয় ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে লেখাটি সাধ্যমত প্রচার করার, এবং যারা বালুর প্রাসাদের মানহাজের প্রচারণা করে যাচ্ছে এবং এ কষ্টকল্পনার মোহে জিহাদি মানহাজের সমালোচনায় লিপ্ত হচ্ছে, তাদের সাথে অযথা, অর্থহীন তর্ক না করে, এ লেখাটি তাদের, তাদের সমর্থক ও পাঠকদের কাছে পৌছে দেয়া।

বালুর প্রাসাদ – জামায়াতে ইসলামি ও নব্য দেওবন্দিদের বিভ্রান্ত মানহাজ

অনেকে তাগুতের মুঠোর ভেতরে এমন এক দীর্ঘমেয়াদী, শান্তিপূর্ণ তারবিয়াহ, তাসফিয়াহ আর তাযকিয়াহর কথা বলেন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শারই, টেকনিকাল – নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। দীর্ঘদিন ধরে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সামাজিক প্রভাব অর্জন করা হবে। তারপর একসময় এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত ও নিখুত এক আঘাতের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখল করা হবে।

এধরনের পদ্ধতির প্রচারক ও প্রবক্তাদের অনেকে বলেন – *আমরা না, আমাদের সন্তানেরা এই আঘাত হানবে।*

আমরা বুঝি না যখন পিতাদের অবস্থা এই, তখন সন্তানেরা আদৌ কিভাবে আঘাত করবে!

এ ব্যাপারে শাইখ আবু কাতাদা উমার মাহমুদ উসমানের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি –

"প্রথমত, আমাদের বুঝতে হবে পূর্নাঙ্গ ও ব্যাপক বিজয় হল ছোট ছোট অনেকগুলো বিজয়ের সমষ্টি (অর্থাৎ ছোট ছোট অনেকগুলো বিজয়ের মাধ্যমে, এক সময় পূর্নাঙ্গ ও ব্যাপক বিজয় আসবে, হঠাৎ করে কোন একটি যুদ্ধের পর বিজয় চলে আসবে না)। জয়পরাজয়ের ময়দানে এমন কিছু ঘটা সম্ভব না যা রাতারাতি বিজয়ী ও বিজিত নির্ধারন করে দেবে। কারণ রাতারাতি অভূতপূর্ব পরিবর্তনের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। কেবল আমাদের শাইখ, দাঈ আর নেতাদের কল্পজগতেই এর অস্তিত্ব আছে। শত্রুর চোখের আড়ালে নির্বিঘ্নে প্রশিক্ষন ও প্রস্তুতির পর একটি ঝটিকা ও তীব্র হামলার মাধ্যমে শত্রুর ধ্বংসের মাধ্যমে এক নিখুত, মসৃণ বিজয়ের স্বপ্ন তারা লালন করেন এবং এমন বিজয়ই তারা আশা করেন। এমন বিজয়ে রক্তপাতও কম।

আমাদের শাইখরা ক্রমাগত এধরনের ধারণা প্রচার করে যান, এবং কুফফারের সাথে সংঘর্ষ ত্যাগ করে ইলম অর্জন ও "প্রস্তুতি"র দিকে মনোযোগ দেয়ার কথা বলার সময় এধরণের ধ্যানধারণাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেন। জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কারণ ধারণা হিসাবে এটি খুব পরিপাটি, সুন্দর ও ফুলেল। আর হবে না-ই বা কেন! এ ধরণের ধ্যানধারণা অনুযায়ী ফুলের মতোই ইসলামপন্থিদের হাতে ক্ষমতা, শাসনকর্তৃত্ব এবং বিজয় তুলে দেয়া হবে! কেনই বা এ ধারণা ফুলেল হবে না, যখন এ দর্শনের জন্ম স্বপ্নচারীদের কল্পনার জগতে?

আজ আমরা বিক্ষোভ, অরাজকতা ও পুনঃপুন সংঘর্ষের পর্যায় অতিক্রম করা ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিজয়ের আশা করি। অথচ আল্লাহ জাল্লা জালালাহু কুরআনে এই পর্যায়ের কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন –

"...কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।" (আন-নিসা, ১০৪)

"...তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে।..." (আত-তাওবাহ, ১১১)

এ আশা অবাস্তব, অসম্ভব। এটা এক ধরণের চিন্তার বিচ্যুতি, যা গড়ে উঠেছে বিভ্রান্তির ফিকহের ওপর। আজ আমরা বিভিন্ন শাইখের কাছ থেকে নতুন এক ফিকহের কথা শিখি। এমন এক ফিকহ যা রাজনৈতিক বৈচিত্র, ক্ষমতাসীনদের সাথে আপস, ইসলামি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক-সামরিক-বিচারিক উচ্চপদে কাফিরদের নিয়োগের অনুমোদন দেয়, কিন্তু আক্রমনাত্বক জিহাদের অনুমোদন দেয় না। নিঃসন্দেহে নতুন এ ফিকহ হল দূষিত কল্পনার ফসল, এ কল্পনা হল বদহজমের ফসল, আর এ বদহজম হল সাংঘর্ষিক বিভিন্ন ধারণাকে একত্রিত করার ফসল।

এর কারণ হল, বর্তমানে আমাদের পৃথিবী শয়তানী নানা কাঠামোতে ভরে গেছে এবং চারিরিক ছেয়ে গেছে অনাচার ও অন্যায়ে। ইসলামি চেতনা ও স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। এমন অবস্থায় যখন কোন ইসলামি ব্যক্তি শারীয়াহর অবস্থান থেকে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে, এবং উপরে বর্ণিত এই ধারণা আকড়ে ধরেন, তখন তা তাকে বাধ্য করে "সালাফদের কাঠিন্য" থেকে "খালাফদের কোমলতার" দিকে ধাবিত

হতে।” [বাইনা মানহাজাইন, শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি]

অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন প্রকৃত সমাধানকে (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) প্রত্যাখ্যান করে। তারা এ সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ এ পথ কঠিন। আর খুব অল্প সংখ্যক লোকই শুরুতে এ পথে আগাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অবশ্য তারা এটা স্বীকার করে না। জিহাদকে প্রত্যাখ্যান করার স্বপক্ষে তারা হয় এমন সব প্রমাণ পেশ করে যেগুলোর কোন গ্রহনযোগ্যতা আল্লাহর কাছে নেই, অথবা বিভিন্ন বিভ্রান্তিপূর্ণ স্লোগানের আশ্রয় নেয়। তারা যদি আসলেই সৎ হতো, যদি তারা নিজেদের সাথেও সৎ হতো, তাহলে তারা বলতো – ***এ পথ দীর্ঘ এবং কন্টকাকীর্ন, আর দুর্বল পদযুগল জ্বলন্ত অঙ্গার পেরোতে অক্ষম।*** সুতরাং, আন্তরিকতা ও সততার অভাব দুঃখজনকভাবে আমাদের জন্য বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।

এক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের প্রবন্ধ খুজে পেলাম। ৯০ এর দশকে মিশরে হওয়া ফিতনার সময় উনি শান্তিপূর্ণ ধারায় ঝুকে পড়েন। এ প্রবন্ধে তিনি জিহাদি আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন, কারণ জিহাদি আন্দোলন সামগ্রিক ইসলামি আন্দোলনকে সামরিকায়ন করতে চায়। তার মতে এটা ভুল, কারণ ইসলামি আন্দোলন নাকি পুরোপুরি একটি দাওয়াতি আন্দোলন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের (রাঃ) নিয়ে কী করেছিলেন? তিনি কি সাহাবিদের (রাঃ) জামাতের সামরিকায়ন করেননি? শারীয়াহ আর এ মহাবিশ্বের সার্বজনীন আইনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর ﷺ চেয়ে অধিক অবগত কে? আর তিনি ﷺ কেনই বা এমন করবেন না, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাদিসে কুদসিতে (হাদিসটি সহিহ মুসলিমে আছে) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন – যারা তোমার অবাধ্য হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমার অনুগত তাদের নিয়ে”।

আজকে দা’ই বলতে আমরা যা বুঝি, এই সংজ্ঞায় সাহাবিদের (রাঃ) দা’ঈ কারা ছিলেন? মুসাব (রাঃ), মুয়ায (রাঃ), বিরে মাউনার ঘটনার ক্বারিগণ। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবি (রাঃ) ছিলেন মুজাহিদ, বরং যারা দা’ঈ ছিলেন তারাও ছিলেন মুজাহিদ ও শহিদ। যদিও অধিকাংশ সাহাবি (রাঃ) মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি তাঁরাই (রাঃ) ছিলেন আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বত্তোম দুআত। কারণ আক্রমণাত্মক জিহাদ (জিহাদ আত-তালাব) হল মুক্ত ও কার্যকরীভাবে সব মানুষের কাছে দাওয়াহ পৌছানোর পথ। আর যেসব কুফফার বা মুরতাদ উম্মাহকে দখল করে রাখে, অথবা তাওহিদের দাওয়াহকে অকার্যকর করার জন্য উম্মাহর সামনে যেসব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, তা থেকে মুক্তির পথ হল রক্ষণাত্মক জিহাদ (জিহাদ আল-দাফ)। সুবহান আল্লাহ, কতোই না সুন্দর এক দ্বীন। এ হল সেই দ্বীন যা মহাবিশ্বের সার্বজনীন নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ – আফসোস, যদি আমরা বুঝতাম!।

প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্য হল বাছাই করা কিছু লোককে আকৃষ্ট করা। জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে সাড়া আসবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা থেকে নুসরত ও বিজয়ের পর। দা’ঈদের কথা সত্যিকার ভাবে শুনলে, দাওয়াহ অন্তরে প্রবেশ করে। জ্বিনদের দল যখন কুরআন শুনলো তারা শুধু সাড়াই দিলো না, নিজেরাও সর্তককারী ও দুআতে পরিণত হল। একারনেই তাওহিদের দাওয়াহ থেকে জনসাধারণের মনোযোগ সরিয়ে রাখা ও মানুষের চিত্ত বিক্ষিপ্ত রাখার বিভিন্ন উপায় তাওয়াগ্বিত চারিদিকে ছরিয়ে ছিটিয়ে রাখে।
কাজেই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে একজন বিখ্যাত দা’ঈ আফসোস করে বলতেন – এক বছর ধরে যা আমি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলাম, টিভি পর্দায় নর্তকীর ৫ মিনিটের নাচ তা ধ্বংস করে দিল।

সকল প্রকার মিথ্যা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত আল্লাহর নিখুত দ্বীন এমন কোন নির্দেশ নিয়ে আসেনি যা ফলাফল দেয় না। আর তাই শারীয়াহ আমাদের প্রথমে তাওহিদের দাওয়াহর পথের এসব প্রতিবন্ধক ও

মনযোগ বিক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। যাতে করে দাওয়াহ নির্বিঘ্নে জনমানুষের কাছে পৌছে এবং তাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়।

নিশ্চয় সত্যাবাদী নবীর ﷺ দাওয়াহ আমাদের সময়ের যে কারো দাওয়াহর চেয়ে বেশি কার্যকরী। একজন কাফির শুধু তাঁর ﷺ মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে বাধ্য হত – এ কোন মিথ্যাবাদির চেহারা না। তাঁকে ﷺ সাহায্য করা হয়েছিল এবং দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল ওহি দিয়ে। তিনি ﷺ কুফফারের সব সন্দেহ ও বিরোধিতার জবাব দিয়েছিলেন সুন্দরতম ভাষায় যা ছিল তাদের কাছে সহজবোধ্য, কারণ তিনি ﷺ তাদের ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, এবং ভাষার উৎকর্ষের অধিকারী ছিলেন। তিনি ﷺ এমন অনেক ধরণের অবিশ্বাসের সাথে লড়াই করছিলেন, যার অনুসারীরা হয়তো আজকের কাফিরদের চেয়ে অনেক সহজে সাড়া দিতো, কারণ তাদের চিন্তা আজকের কাফিরদের মতো এতোটা বিভ্রান্ত ছিল না। যখন কুরাইশদের কাউকে বলা হত – তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (কুরআন, ৫২:৩৫)– আর তারপর সে পাথরের মূর্তিগুলোর দিকে তাকাতো – নবীর ﷺ দাওয়াহতে সাড়া দিয়ে ইমান গ্রহণ করা তার জন্য অনেক সহজ ছিল। কিন্তু তবুও তারা দাওয়াতে সাড়া দেয়নি, এবং তাঁর ﷺ দাওয়াহ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই ইসলাম গ্রহন করেছিল।

কিন্তু যখন সাথে কিছু লোক নিয়ে তিনি ﷺ তাদের আহবান করলেন, যখন তরবারী খাপমুক্ত হল – তারা সাড়া দিল। তাহলে আমরা নিজেদের ব্যাপারে কী ফলাফল আশা করছি যখন আমাদের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ নেই, তাঁর সাহাবিরাও (রাঃ) নেই? আমরা এমন এক রিদ্দাপূর্ণ ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি যা নিজেকে ইসলাম দাবি করে, আর আমাদের দাওয়াতে সাড়া প্রায় নেই বললেই চলে – অথবা আমরা লড়াই করছি কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধে, যারা দাবি করছে কুরআন তাদের দ্বীনের অনুমোদন দেয় এবং তারাই বুদ্ধিবৃত্তিক, আধুনিক মানবতার প্রগতিশীল উন্নয়নের চূড়া? জনসাধারণ ও আমাদের মাঝে শত্রু বিশাল সব প্রতিবন্ধক তৈরি করে রেখেছে। জনসাধারণ ও ইসলামী আন্দোলনগুলোকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যুগে যুগে তাওহিদের দাওয়াহর বিরুদ্ধে এটাই কাফিরদের পদ্ধতি ছিল। এমন অবস্থায় আমরা কীভাবে ভাবতে পারি যে আমরা অধিকাংশে মানুষের অন্তর জয় করে নেবো অথবা যারা সাড়া দিয়েছে এ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদেরও দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারবো?

এই চিন্তার ধারকবাহকরা তাগুতের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলনের অগ্রগতির কথা বলেন তারা ভুলে যায়, অথবা ভুলে যাবার ভান করে যে বিভিন্ন ভূখন্ডের তাগুতেরা ইসলামি আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করে। আর যখন সংসদের দু-একটা পদ – যা তাদের কাছেও মূল্যহীন – তারা ইসলামী আন্দোলনগুলোকে দিতে চায় না, সেখানে কিভাবে তারা এমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেবে মুসলিম তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকবে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাহিনী বা অন্য কোন শক্তি থাকবে? অবধারিতভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর কোন মিথ্যা গল্প সাজিয়ে কিংবা অন্য কোন অজুহাতে তাগুত এই প্রতিষ্ঠান এবং এর সমস্ত অর্থ, সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেবে – তখন কিভাবে বাঁধা দেয়া হবে? কোন শক্তিবলে? কোন পদ্ধতিতে? বস্তুত যখন তাগুত এমনটা করবে, তাদের (প্রতিষ্ঠান গড়ে টোলার পদ্ধতির প্রচারক) এই পদ্ধতি সাধারণ মুসলিমদের এমন এক অবস্থায় এনে ফেলবে যখন তাদের সামনে না আদর্শ থাকবে, না লড়াইয়ের বাস্তব কোন পথ থাকবে। পার্থিব দুনিয়া আবারো তাদের ছো মেরে নিয়ে যাবে। ফলে পরবর্তী প্রজন্মকে শুরু করতে হবে আবারো শুরু থেকে। এভাবে চক্র চলতে থাকবে। তাদের জিহাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, কারণ জিহাদের ব্যাপারে কোন বাস্তবিক ও প্রায়োগিক চিন্তা তাদের নেই।

একারনেই জিহাদ কখন ঘোষণা করা হবে, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তাদের কাছ থেকে অদ্ভুত সব কথা শুনবেন। কারণ তারা এমন এক পর্যায়ে জিহাদ শুরু করতে চায় – জিহাদ ছাড়া যে পর্যায় কখনো আসবে না! যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করার পরও এমন বলে থাকে, তবে এটা তাদের অশুভ নিয়ত ও

নিষ্ক্রিয়তায় আনন্দ খুজে পাবার প্রমাণ – কারণ তারা উপলব্ধি করে ঐ দিন কখনোই আসবে না যখন তারা জিহাদ করবে।

তারা এসব "সমাধান" প্রচার করে – তাগুতের নিয়ন্ত্রন বলয়ের ভেতরে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা বা নিজ দল/সংগঠনের সাথে যুক্ত কিছু হাজার মানুষকে পরীক্ষা ও ঝামেলা থেকে বাচিয়ে রাখার মতো মামুলি প্রাপ্তির জন্য। এধরনের সমাধানের ফলাফল হল মুসলিমদের অন্তরে প্রজ্জলিত ইমানের শিখা ও উৎসাহের জ্বলন্ত কয়লা নিভিয়ে দেয়া।

এখনই আমাদের সুযোগ, এখনই সেই উপযুক্ত প্রেক্ষাপট বিদ্যামান যা হয়তো আবারো ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। যদি আমরা এ সুযোগ হারাই তাহলে উপযুক্ত সময়ে আরেক প্রজন্ম আসবে যারা আমাদের মতোই এ দুর্যোগপূর্ণ অশান্ত ময়দাতে অবতীর্ণ হবে, তবে তারা আমাদের আজকের ব্যার্থতার কারনে, আমাদের অভিশাপ দেবে। এখনই সুযোগ। যদি আমরা এ সুযোগ হারাই তাহলে মুসলিমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাগুতের আদালতের কাছে অনুগত হওয়া আর টিভিতে প্রচারিত দেহজ আর অন্যান্য জাগতিক সুখের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হবে। আর তাগুত তো শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক – উভয়ের জন্যই এ ধরণের নানা বিষয়ের জোগান দিতে সিদ্ধহস্ত। এমন অবস্থায় হয়তো উম্মাহর অধিকাংশের মৃত্যু হবে প্রচন্ড গুনাহ অথবা কুফরের ওপর। অথচ যদি কুফরের বিরুদ্ধে তাওহিদের এ লড়াইয়ে পুরো উম্মাহ ধ্বংসও হয়ে যায় সেটাও উত্তম, কারণ তাহলে তারা হবে আসহাবুল উখদুদ, অথবা হাসান রা এর বংশধরদের মতো শহিদ। যেমন শাইখ সুলাইমানব ইবন সিহমান বলেছেন – যদি তোমরা মরুভূমি আর শহরে লড়াই করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও, তবুও সেটা পৃথিবীর বুকে এমন তাগুত নিযুক্ত হবার চেয়ে উত্তম যে আল্লাহর শরীয়াহর পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করবে।

তারা দাবি করে – **"আমরা মাক্কি যুগে আছি, আমরা মাক্কি যুগের নিয়মে কাজ করছি"**। অথচ মাক্কি যুগ ছিল কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে সত্য ঘোষণা করা এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের যুগ। তাদেরকে সতর্ক করা, তাদের মিথ্যা বিশ্বাসকে ও তাদের মিথ্যা ইলাহদের তাচ্ছিল্য করার যুগ। আরও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, মাক্কি যুগ ছিল বাস্তবিক প্রস্তুতির পর্যায় যখন সশস্ত্র আনসারদের একত্রিত করা হয়েছিল এবং প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল – প্রয়োজনে বাড়িঘর, পরিবার, সম্পদ এবং তথাকথিত নানা স্বার্থ ত্যাগে সাহাবিরা (রাঃ) প্রস্তুত ছিলেন। তারা রাঃ জানতেন জিহাদের মাধ্যমে সম্পদ, ভূমি, মসজিদ আর অন্যান্য স্বার্থ অর্জিত হয়। আর এসব স্বার্থের দোহাই দিয়ে জিহাদ ছেড়ে দেয়া, আর এসবের ওপর ভরসা করা হল জিহাদের পথে চরম প্রতিবন্ধক। জিহাদ ছেড়ে দিয়ে, শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়ে এসব স্বার্থ আকড়ে থাকে এবং এগুলর ওপর ভরসা করাই, পরবর্তী সময়ে এসব স্বার্থ হারানো কারণ।
তারা দাওয়াতি কাজকে, এসব কাজের ফসলকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে, আর প্রয়োজনে ঘর ও সম্পদ ত্যাগ করার নির্দেশকে পরিত্যাগ করে। তারা সত্য বলা আর আনসার গড়ে তোলাকে ছেড়ে দেয়, কারণ – পূর্ণাঙ্গ সত্য বললে, বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত দিলে, সশস্ত্র আনসার গড়ে তুলতে গেলে "দাওয়াতি কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে – দাওয়াতি কাজের সব অর্জন বৃথা যাবে"। তাহলে মাক্কি যুগের আর কী বাকি রইলো? মাক্কি যুগের কোন কাজটা তারা করছে? কিভাবে তারা দাবি করে নবীর ﷺ মাক্কি জীবনের সুন্নাহ তারা অনুসরণ করছে?

যখনই নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা মোটামুটি একটা অবস্থানে পৌছায়, তাগুত তার বাহিনি নিয়ে আসে আর কোন ঝামেলা ছাড়া, কোন উচ্চবাচ্য ছাড়াই ১০-১৫ বছরের ফসল কেটে নিয়ে যায়। এটাই যুগ যুগ ধরে তাওয়াগ্বিতের পলিসি – শত্রুর বিষদাত ভেঙ্গে দেয়ার পলিসি। আর এরপরে এই দলগুলো গভীর অন্ধকার চক্রে ঘুরপাক খেতে শুরু করে, আবারো তারা প্রথম ধাপে ফিরে যায়। আবার শুরু থেকে শুরু করে। আর অনেক সময় সেই সামর্থ্যও তাদের থাকে না।

প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদ্ধতির প্রচারকরা যাদেরকে “হঠকারী”, “মাথাগরম” ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেন, তারা তাগুতের বিরুদ্ধে কিছু করুক আর না করুক, সময় আসলে তাগুত “বিষদাত ভেঙ্গে দেয়া”র পলিসি বাস্তবায়ন করবেই। এজন্য অন্য কোন কারণের দরকার নেই, দরকারমতো অজুহাত তাগুত তৈরি করে নেবে।

এরকম অনেক উদাহরণ বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তাগুতের কোন ক্ষতি করা ছাড়াই, তাগুতকে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে দু’বার ভাবতে বাধ্য করা ছাড়াই, অনেক যুবক এসব সংগঠনের মানহাজের বলি হয়েছে। আর কিভাবেই বা এরা তাগুতের কোন ক্ষতি করবে, যখন তারা মহাবিশ্বের সার্বজনীন নিয়ম এবং শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী এজন্য প্রস্তুতই না? ইসলামী আন্দোলনগুলো এবং এগুলোর সবগুলোকে শাখাকে অকার্যকর করে দিতে প্রতি ১০-১৫ বছর পর পর তাগুত বিষদাত ভাঙ্গার এ পলিসি বাস্তবায়নে নামে। যাকে ইচ্ছা তাঁকে হত্যা করে, যাকে ইচ্ছা জেলে দেয়, মসজিদ আর মিম্বার থেকে দাওয়াতি ও দাতব্য কাজ বন্ধ করে দেয়। ধীরে ধীরে ইসলামি আন্দোলনের যে শক্তি ও প্রভাব গড়ে উঠেছিল – সেগুলো গুড়িয়ে দেয়, যাতে করে তার বিরুদ্ধে এই শক্তি ব্যবহার করা না যায়। যখন তাগুত এ পলিসি বাস্তবায়ন করে এসব আন্দোলনের নেতারা এ অবস্থা মেনে নেয়, আর এ অবস্থাকে পরীক্ষা নাম দিয়ে পরাজয়ের প্রতি আত্মসমর্পন করে। পরীক্ষার ব্যাপারে এসব লোকের ধ্যানধারনা খুব অদ্ভুত, যা পরীক্ষার ব্যাপারে সঠিক বুঝের সাথে মেলে না।

আমি তাদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার লেখা পড়েছি। সে এমন একটি ঘটনার কথা বলছিল, যা অনুধাবনের ক্ষমতা তার ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না কিভাবে “উন্নত চিন্তার” এবং আল্লাহর দ্বীনের পথে কাজ করতে সক্ষম যুবকেরা এমন কাজের পেছনে (জিহাদি আন্দোলন) জীবন দিচ্ছে যা তার ভাষায় – “নিম্নমানের চিন্তার ফসল”। সে বুঝতে পারছিল না এটা কিভাবে সম্ভব। তার ইচ্ছা ছিল এই যুবকেরা তাদের জিহাদ, তাদের লড়াই, তাদের প্রচেষ্টা বরাদ্দ করবে ধীরে ধীরে উন্নয়নের রক্ষনাত্বক “জিহাদের” ময়দানে। তার দাবি হল – ধীরেধীরে, সুচারুভাবে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় কুফরি শক্তি মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। সে চায় আমরা সবাই আমাদের ফিতরাত ও সহজাত বুঝকে অস্বীকার করি, এবং ওই কথা মেনে নেই যা যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক। যে কোন সুস্থ মানুষের চিন্তা তাকে বলে দেবে – তাগুত তার চোখের সামনে এমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেবে না যা একসময় তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তাগুতের অধীনস্ত অবস্থায় এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অসম্ভব। তাগুত কেবল তখনই এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দেবে যখন সে জানে ইচ্ছামতো সময়ে সে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত এগুলো একসময় কুফরি শক্তির পক্ষে বিনিয়োগে পরিণত হবে।

তিনি সত্য বলেছেন, যিনি বলেছেন –

দালানকোঠার কাজ শেষ হবে কবে?
তুমি গড়বে, ওরা ভাঙবে

সাহাবিগণ (রাঃ) কি যোগ্য ছিলেন না? তারা কেন এই “উচ্চমানের চিন্তার” পথ বেছে নিলেন না? জিহাদের পথ বেছে নেয়া নিম্নমানের চিন্তার ফসল – তার এই বক্তব্য নিয়ে কিছু না-ইবা বললাম। এই যুবকদের সাথে কথোপকথন, তাদের দিকনির্দেশনা দেয়া, শিক্ষা দেয়া, প্রশিক্ষন দেয়া, তাদের পাশাপাশি লড়াই করার সামর্থ্য সে রাখে না। নিজেকে সে এসি লাগানো মসজিদ কিংবা অফিসের ফ্যানের নিচে ছাড়া কল্পনা করতে পারে না – বোমার আঘাত ছাদের অর্ধেক ধ্বসে পড়া মসজিদের ভেতরে বসে বিশুদ্ধ তাওহিদের দারস আর মুজাহিদিনের মধ্যে ইলম ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হিজরত করার চিন্তা সে হজম করতে পারার প্রশ্নই আসে না। এসব জিনিস তার চিন্তার জগত থেকে শত সহস্র মাইল দূরে। সে শুধু তার নিজের বুঝের ওপর উন্নয়নের রক্ষনাত্বক জিহাদ চায়!

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।